بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ১৬ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর (সা.) প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার কথা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত খারেজা বিন যায়েদের শাহাদতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত খারেজা (রা.) উহুদের যুদ্ধে খুবই সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদতের মর্যাদা অর্জন করেন। তিনি বর্শার লক্ষ্যে পরিণত হন এবং ১৩টির অধিক আঘাত পান। তিনি (রা.) আঘাতের কারণে নিথর অবস্থায় পড়ে ছিলেন, এ অবস্থায় সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তার পাশ দিয়ে যায়। সে তাকে চিনতে পারে এবং আক্রমণ করে শহীদ করে দেয়। এরপর তার (রা.) লাশকে বিকৃতও করে আর বলে যে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলীকে অর্থাৎ আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালাফকে হত্যা করেছিল। এখন আমি সুযোগ পেয়েছি, মুহাম্মদের (সা.) এই সঙ্গীদের মধ্য হতে উত্তম সঙ্গীদের হত্যা করব এবং নিজের মনকে প্রবোধ দেবো। সে হযরত ইবনে কাওকাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অওস বিন আরকামকে শহীদ করে। হযরত খারেজা এবং হযরত সা'দ বিন রবীকে একই কবরে দাফন করা হয় যিনি তার চাচাতো ভাই ছিলেন।

রেওয়ায়েত রয়েছে যে, উহুদের দিন হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, হে মুসলমানেরা! আল্লাহ্ এবং তোমাদের নবীর সাথে সংযুক্ত থাকো। তোমরা যে বিপদে নিপতিত হয়েছ তা (শুধুমাত্র) তোমাদের নবীর অবাধ্যতার কারণে এসেছে। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ করো নি। অতঃপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) নিজের শিরস্ত্রাণ ও বর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি এটির প্রয়োজন আছে? খারেজা বলেন, না, তুমি যেটির আকাঙ্ক্ষা করছ আমিও তা-ই চাই, অর্থাৎ শাহাদাত। এরপর তারা সবাই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) বলতেন যে, আমাদের চোখের সামনে যদি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কোনো কষ্ট হয় তাহলে নিজ প্রভুর সন্নিধানে আমাদের কোনো অজুহাত গৃহীত হবে না। আর হযরত খারেজা (রা.) বলতেন, আমাদের প্রভুর সন্নিধানে আমাদের কোনো অজুহাতও গৃহীত হবে না এবং কোনো যুক্তিও না। হযরত আব্বাস বিন উবাদাকে সুফিয়ান বিন আব্দে শামস সালামী শহীদ করেছিল আর খারেজা বিন যায়েদের শরীরে তিরের কারণে ১০টির অধিক আঘাত লেগেছিল।

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত খারেজা বিন যায়েদের পাশ দিয়ে যান। হযরত খারেজা আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি প্রায় ১৩টি প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? (এটি কাফিরদের দ্বিতীয় আক্রমণের কথা হচ্ছে)। হযরত খারেজা (রা.) বলেন, তাঁকে (সা.) শহীদ করা হলেও

নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা চিরঞ্জীব; তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। এই ছিল তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) ঈমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, তাই তোমরা নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো। অর্থাৎ এখন শত্রু তোমাদের সাথে লড়াই করছে, তাই তোমরাও লড়াই করো। আমাদেরও কাজ হলো আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা।

এরপর হযরত শাম্মাস বিন উসমানের শাহাদতের ঘটনা রয়েছে। হযরত শাম্মাস বিন উসমান বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছেন। মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আমি শাম্মাস বিন উসমানকে ঢালের ন্যায় পেয়েছি। মহানবী (সা.) ডানে-বামে যেখানেই তাকাতেন সেখানেই শাম্মাসকে দেখতে পেতেন, যিনি উহুদের যুদ্ধে নিজ তরবারি দ্বারা শত্রুকে প্রতিহত করছিলেন। এমনকি মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে যান। যখন তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করা হয় এবং পাথর এসে লাগে তখন হযরত শাম্মাস নিজেকে মহানবী (সা.)-এর সামনে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাকে এ অবস্থায় উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ হযরত শাম্মাসকে উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার মাঝে তখনও প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তাকে (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত উম্মে সালামা বলেন, আমার চাচাতো ভাইকে কি আমার পরিবর্তে অন্য কারো কাছে নিয়ে যাওয়া হবে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে (রা.) উঠিয়ে হযরত উম্মে সালামার বাড়িতে নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে (রা.) সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি (রা.) তার বাড়িতেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধ থেকে আহতাবস্থায় এসেছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত শাম্মাসকে উহুদের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে সেই কাপড়েই সমাহিত করা হয়। মদীনায় দুদিন পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন, কিন্তু তাকে সমাহিত করা হয় উহুদের প্রান্তরে। যুদ্ধ শেষে তাকে (রা.) যখন আহতাবস্থায় উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে এক দিন ও এক রাত তিনি জীবিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, সেই অবস্থায় তিনি কোনো খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন নি। তিনি চরম দুর্বল ছিলেন, বরং অচেতন অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুকালে হযরত শাম্মাসের বয়স ছিল ৩৪ বছর, অর্থাৎ তিনি তখন যুবক ছিলেন।

ইতিহাস হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) সম্পর্কে এমন ঘটনা সংরক্ষণ করেছে যা রসূলপ্রেমের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে এবং তা ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের উৎকৃষ্টতম মান প্রতিষ্ঠারও একটি উদাহরণ। উহুদের যুদ্ধে যেখানে হযরত তালহা (রা.)-র রসূলপ্রেম ও ভালোবাসার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) কত দৃঢ়তার সাথে নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দেন যেন তাঁর গায়ে কোনো তির বিদ্ধ হতে না পারে, সেখানে হযরত শাম্মাস (রা.)-ও বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত শাম্মাস মহানবী (সা.)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং সকল আঘাত নিজের ওপর নিয়ে নেন। মহানবী (সা.) হযরত শাম্মাস সম্পর্কে বলেন, **শাম্মাসকে আমি যদি কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে চাই তাহলে ঢালের সাথে তুলনা করব, কেননা সে উহুদের প্রান্তরে আমার জন্য এক ঢালেই তো পরিণত হয়েছিল। সে আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মানসে আমৃত্যু লড়াই করে গিয়েছে।** মহানবী (সা.) বলেন, **আমি যেখানেই তাকিয়েছি সেখানেই শাম্মাসকে প্রবল বিক্রমে লড়াই করতে দেখেছি।** শত্রুরা যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে সমর্থ হয় এবং তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়ে যান তখনও শাম্মাস (রা.)-ই ঢাল হয়ে সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমনকি তিনি (রা.) নিজে গুরুতর আহত হন। সেই অবস্থাতেই তাকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন,

সে আমার চাচাতো ভাই। আমি তার কাছের মানুষ এবং আত্মীয়। তাই আমার বাড়িতেই তার সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা প্রভৃতি হওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষত গভীর হওয়ার কারণে দেড়-দুই দিন পরেই তার মৃত্যু হয়। মহানবী (সা.) বলেন, শাম্মাসকেও যেন তার কাপড়েই সমাহিত করা হয় যেভাবে অন্য শহীদদের করা হয়েছে।

অতঃপর হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.)-র শাহাদতের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাকে শহীদ করেছিল। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, আবান বিন সাঈদ হযরত নু'মান বিন মালেককে (রা.) শহীদ করেছিল। হযরত নু'মান বিন মালেক, হযরত মুজাযের বিন যিয়াদ এবং হযরত উবাদা বিন হাস্‌সাস (রা.)-কে উহুদের যুদ্ধের সময় একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। হযরত নু'মান বিন মালেক (রা.) মহানবী (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধের জন্য যাত্রা ও আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের সাথে তাঁর (সা.) পরামর্শ করার সময় খুবই দৃঢ়তার সাথে নিবেদন করেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব।'** মহানবী (সা.) তাকে বলেন, 'সেটি কীভাবে?' তখন হযরত নু'মান (রা.) নিবেদন করেন, 'এর কারণ হলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), আর আমি যুদ্ধ থেকে কখনো পলায়ন করব না।' একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' এরপর তিনি সেদিনই শহীদ হন। খালিদ বিন আবু মালেক জা'দী বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার গ্রন্থে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, হযরত নু'মান বিন কাওকাল আনসারী দোয়া করেছিলেন, **'হে আমার প্রভু, তোমার শপথ! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতের সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে হাঁটতে থাকব।'** এরপর তিনি সেদিনই শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন, [মহানবী (সা.) দিব্যদর্শনে দেখেছেন আর এটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন।] তিনি বলেন, **'আমি তাকে দেখেছি যে, সে মাধ্যমে জান্নাতে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছিল এবং সে মোটেও খুঁড়িয়ে হাঁটছিল না।'**

এরপর রয়েছে হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.)-র বিবরণ। তিনিও উহুদের যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন; তারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংবাদ শুনে বলে যে, 'মহানবী (সা.) যেহেতু শহীদ হয়ে গেছেন তাই এখন তোমরা তোমাদের জাতির নিকট ফিরে যাও, তারা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেবে।' তখন অন্যরা বলে ওঠে, 'মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে কি তোমরা তোমাদের নবীর আনীত ধর্ম এবং তাঁর শিক্ষার জন্য আমৃত্যু লড়াই করবে না?'

হযরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্ (রা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে আনসারের দল! মুহাম্মদ (সা.) যদি শহীদ হয়েও থাকেন, তবুও তো আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আছেন; তাঁকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। নিজেদের ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ করো। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বিজয় ও সফলতা দেবেন।' একথা শুনে আনসারী মুসলমানদের একটি দল দণ্ডায়মান হয় এবং তারা হযরত সাবেত (রা.)-র সাথে মিলিত হয়ে মুশরিকদের সেই দলটির ওপর আক্রমণ করে যাতে খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইকরামা বিন আবু জাহল, আমর বিন আস এবং যিরার বিন খাত্তাব ছিল। মুসলমানদের এই ছোট্ট একটি দলকে আক্রমণ করতে দেখে খালিদ বিন

ওয়ালীদ তাদের ওপর জোরালো পাল্টা আক্রমণ করে এবং হযরত সাবেত বিন দাহ্দাহ্ (রা.) এবং তার আনসারী সঙ্গীদের শহীদ করে দেয়।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর খাত্মী বলেন, 'সাবেত বিন দাহ্দাহ্ উহুদের দিন সম্মুখে অগ্রসর হন আর মুসলমানরা তখন ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তিনি উঁচু স্বরে ডাকতে থাকেন, 'হে আনসারের দল! আমি সাবেত বিন দাহ্দাহ্, (তোমরা) আমার কাছে এসো। মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্যিকার অর্থেই নিহত করে থাকেন তাহলে (স্মরণ রেখো,) আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আছেন, তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না। কাজেই, তোমরা তোমাদের ধর্মের খাতিরে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং তোমাদের সাহায্য করবেন।' এরপর (তার এই আহ্বান শুনে) আনসারের একটি দল তার নিকট সমবেত হয়। তিনি মুসলমানদের সাথে নিয়ে কাফিরদের ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। তাদের মোকাবিলায় কাফিরদের তুখোড়, সুদক্ষ সেনাদল এগিয়ে আসে যাদের মধ্যে তাদের কয়েকজন নেতা খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আস, ইকরামা বিন আবু জাহ্ল এবং যিরার বিন খাত্তাব ছিল। এরা সবাই সম্মিলিতভাবে তাদের ওপর আক্রমণ রচনা করে। হযরত সাবেত (রা.)-র ওপর খালিদ বিন ওয়ালীদ বর্শা দিয়ে আঘাত হানে এবং বর্শা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। হযরত সাবেত (রা.) শহীদ হয়ে (মাটিতে) লুটিয়ে পড়েন এবং তার সাথে থাকা অন্যান্য আনসারও শাহাদত বরণ করেন। একারণেই বলা হয় যে, সেদিন মুসলমানদের মধ্যে সবার শেষে তারাই শহীদ হয়েছেন।

এক রেওয়ায়েত অনুসারে খালিদ সামনে অগ্রসর হয়ে বর্শা নিক্ষেপ করে যার ফলে হযরত সাবেত (রা.) আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকজন (তাকে) তুলে এনে চিকিৎসা শুরু করে। রেওয়ায়েত অনুসারে সে সময় রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু হুদাইবিয়ার যুদ্ধের পর ক্ষতস্থান হঠাৎ ফেটে যায় এবং এ কারণেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন দাহ্দাহ্ (রা.)-র জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে ফেরত আসেন। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধের পর (ক্ষতস্থান) ফেটে গিয়েছিল মর্মে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেটি দুর্বল মনে হয়; (বরং) সেই ঘটনার সময়ই (তিনি) শহীদ হয়েছিলেন।

একই পরিবারের চারজন সদস্যের শহীদ হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাবেত বিন ওয়াক্শ (রা.) এবং রিফা' বিন ওয়াক্শ (রা.) উভয় ভাই উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আর তাদের সাথে সাবেত বিন ওয়াক্শ (রা.)-র দুই পুত্র সালামা বিন সাবেত (রা.) এবং আমর বিন সাবেত (রা.)-ও শহীদ হয়েছিলেন। আমর বিন সাবেত (রা.)-র নাম উসায়রামও বর্ণিত হয়েছে এবং তারা সবাই আনসারের বনু আব্দুল আশ'আল গোত্রের লোক ছিলেন। রিফা' বিন ওয়াক্শ (রা.) একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। রিফা' এবং সাবেত (রা.) উভয় ভাই উহুদের যুদ্ধের দিন একত্রে যুদ্ধ করেছেন। রিফা' (রা.)-কে খালিদ বিন ওয়ালীদ শহীদ করেছে। ইবনে ইসহাকের ভাষ্য অনুসারে সাবেত বিন ওয়াক্শ (রা.)-র শাহাদতের ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে যান তখন সাবেত বিন ওয়াক্শ এবং হুসাইল বিন জাবের, (যার নাম ছিল ইয়ামান এবং তিনি হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতা ছিলেন,) তারা উভয়েই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং সেই দুর্গে ছিলেন যেখানে নিরাপত্তার জন্য মুসলমান নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলে, তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? আমাদের তো আর বেশি আয়ু নেই। আজ যদি আমরা মারা না-ও যাই

তাহলে কাল অবশ্যই মারা যাব। আমাদের কি নিজেদের তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত না? হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শাহাদত লাভের সৌভাগ্য দান করবেন। এরপর এই দুজন তরবারি নিয়ে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লোকজনের সাথে মিশে যান অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদান করেন।

আমর বিন সাবেত ওয়াক্শ আনসারী উসায়রাম নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান-এর বোন ছিল তার মাতা। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন ফজরের নামাযের পর মুসলমান হন। (ফজরের) নামায পড়েন নি; এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। মুসলমানদের সাথে জিহাদ তথা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলো যে কখনো নামায পড়ে নি অথচ সে জান্নাতী। লোকজন এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কে? তখন তিনি (সা.) বলেন, সে হলো উসায়রাম অর্থাৎ আমর বিন সাবেত। এক বর্ণনায় আছে, উসায়রাম তার জাতির সামনে ইসলামকে অস্বীকার করতো। যখন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, তখন উসায়রামের নিকট ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজের তরবারি নিয়ে স্বজাতির কাছে যান এবং লোকদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। এমনকি উপর্যুপরি আঘাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। তখন বনু আব্দিল আশ'আলের লোকজন তাদের শহীদদের লাশ অনুসন্ধান করছিল; হঠাৎ করে তার প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে। (তারা) বিস্মিত হয়ে বলে, এ তো উসায়রাম! কিন্তু তাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমরা তো তাকে রেখে এসেছিলাম; সে তো ইসলামের অস্বীকারকারী। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করে যে, হে উসায়রাম! তুমি এখানে কীভাবে এলে? তোমার জাতিগত আত্মভিমান নাকি ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণে? তিনি বলেন, ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণে; অর্থাৎ ইসলামকে আমি সত্য বলে মেনেছি বিধায় আমি (এখানে) এসেছি। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি এবং নিজ তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে থাকি। এরপর আমার সে অবস্থা হয় যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অতঃপর তিনি লোকদের হাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহানবী (সা.)-এর নিকট তার উল্লেখ করা হলে তিনি (সা.) বলেন, সে জান্নাতী। [আমি তখন এ কারণে থেমে গিয়েছিলাম যে, যেখানে লেখা ছিল– তিনি (সা.) বলেন, সে জান্নাতী; সেখানে রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখা ছিল অথচ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখা উচিত ছিল। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, কোনো সাহাবী হয়তো একথা বলে থাকবেন। কিন্তু যাহোক, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সে জান্নাতী। আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতও এ আঙ্গিকে সঠিক মনে হয় যে, নামায না পড়েই যে জান্নাতে চলে গিয়েছে সে হলো এই ব্যক্তি। শেষ মূহুর্তে এসে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।]

এ বংশের চতুর্থ শহীদ ছিলেন হযরত সালামা বিন সাবেত (রা.)। হযরত সালামা বিন সাবেত (রা.)-র পুরো নাম হলো সালামা বিন সাবেত বিন ওয়াক্শ। হযরত সালামা (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান হযরত সালামা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন। হযরত সালামা (রা.)-র পিতা হযরত সাবেত বিন ওয়াক্শ এবং চাচা হযরত রিফা বিন ওয়াক্শ আর তার ভাই হযরত আমর বিন সাবেত-ও উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এই বংশের অনেক সদস্য উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুখায়ররিক নামে বনু নযীর গোত্রের একজন ইহুদী ছিল। মুহাম্মদ বিন উমর আসলামী বর্ণনা করেন, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কেউ কেউ বলে, সে বনু কায়নুকা গোত্রের সদস্য ছিল। কারো কারো মতে, সে বনু সা'লাবা বিন ফিদইউন-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি ইহুদীদের বড়ো আলেমদের মাঝে একজন ছিল। সে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যাবলি দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে পেরেছিল কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর সে ঈমান আনয়ন করে নি। শনিবার দিন সে বলে, হে ইহুদীদের দল! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে সাহায্য করা তোমাদের ওপর আবশ্যক। [অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী জুমুআর দিনে উহুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় আর সে পরদিন তথা শনিবার বলে।] লোকেরা বলে, আজ তো সাবাতের দিন, আজকে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না। সে বলে, তোমাদের জন্য কোনো সাবাত নেই। অতঃপর নিজ জাতির লোকদের বলে, আমাকে যদি আজ নিহত করা হয় তবে আমার সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদের (সা.) হবে আর তিনি যেভাবে চাইবেন তা ব্যয় করবে। এরপর নিজের তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালে সে লড়াই করতে করতে যখন শহীদ হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, মুখায়ররিক ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) বলেন, মুখায়ররিক ইহুদীদের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে আর পারস্যবাসীদের মাঝে সালমান এগিয়ে গিয়েছে এবং হাবশীদের মধ্যে বেলাল সর্বাগ্রে।

একজন জীবনীকার মুখায়ররিক সম্বন্ধে লিখেছেন, একটি মত হলো, সে ইসলামের জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে তার স্বপক্ষে প্রশংসামূলক বাক্য নিঃসৃত হয়, যার ভিত্তিতে বহু জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ মুখায়ররিককে মুসলমান গণ্য করেছে যাদের মাঝে ইবনে হিশাম, সুহায়লী, ইবনে হাজর, ইবনে কাসীর, বালাযুরী, কাযী আইয়ায, ইমাম নববী এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)-র স্মৃতিচারণ রয়েছে। ইতিহাসে লেখা আছে, খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা তাকে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি বিমুখ করে দিয়েছিল। তার যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে তবে তা কেবল এটিই যে, প্রিয় প্রাণ যেন কোনোভাবে খোদার পথে উৎসর্গ হয়ে যান। সুতরাং তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে এবং **মুজাদ্দাউন ফিল্লাহ্** অর্থাৎ 'খোদার পথে কানকাটা' তার নামের স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শের শাহাদাত লাভের পূর্বে তার দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। ইসহাক বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ আমার পিতা অর্থাৎ সা'দ-কে উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, চলো! আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি। সুতরাং তারা উভয়ে (দোয়া করার জন্য) একই দিকে চলে যান। প্রথমে হযরত সা'দ দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! আগামীকাল যখন আমি শত্রুর মুখোমুখি হব তখন যেন এমন ব্যক্তির সাথে আমার মোকাবিলা হয় যে হবে আক্রমণে কঠোর ও সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বী আর যার প্রতাপ হবে অত্যন্ত গভীর। সুতরাং আমি তার সাথে লড়ব এবং তাকে তোমার পথে হত্যা করব ও তার হাতিয়ারসমূহ করায়ত্ত করব।' এটি শুনে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ 'আমীন' বলেন। এটি ছিল প্রথম ব্যক্তির দোয়া, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ এ দোয়া করেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শের দোয়া এটি ছিল, "হে আল্লাহ্! আগামীকাল (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমি যেন এমন ব্যক্তির মুখোমুখি

হই যে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে আর যার প্রতাপ হবে অত্যন্ত গভীর। আমি তোমার খাতিরে তার সাথে যুদ্ধ করব এবং সে-ও আমার সাথে যুদ্ধ করবে। সে বিজয়ী হয়ে আমাকে হত্যা করবে আর ধরে আমার নাক, কান কেটে নেবে। এরপর যখন আমি তোমার সকাশে উপস্থিত হব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'হে আব্দুল্লাহ্! কার পথে তোমার নাক ও দুই কান কর্তন করা হয়েছে?' আমি নিবেদন করব, 'হে আল্লাহ্! তোমার ও তোমার রসূলের রাস্তায়।' উত্তরে তুমি এটি বলবে, 'তুমি সত্য বলেছ'।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ বাসনা ব্যক্ত করবেন আর তখন আল্লাহ্ও বলবেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' হযরত সা'দ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল। কেননা আমি দেখেছি, তার নাক ও দুটি কান এক সুতায় ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল; অর্থাৎ কর্তিত অবস্থায় দেখি আর তা সুতায় গাঁথা ছিল।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার ধরন ছিল বড়ো অভিনব। হযরত মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হানতাব-এর রেওয়ায়েত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেদিন উহুদ অভিমুখে রওয়ানা হন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পথিমধ্যে মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা শায়খাইনের পাশে রাত্রিযাপন করেন যেখানে উম্মে সালামা একটি (ছাগলের) ঘাড়ের ভুনা মাংস আনেন যা থেকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) খান। অনুরূপভাবে 'নাবিয' আনেন এবং তিনি (সা.) নাবিযও (খেজুর দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয়) পান করেন। এটিও এক ধরনের খাদ্য যা হারীরার ন্যায় তরল হয়ে থাকে। অতঃপর এক ব্যক্তি সে নাবিযের পেয়ালা নেন ও তা থেকে অল্প পান করেন, এরপর সে পেয়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ নেন আর পুরোটাই খেয়ে ফেলেন। এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের নিকট নিবেদন করেন, আমাকেও কিছুটা দাও। তুমি কি জানো যে, কাল সকালে তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে? অর্থাৎ যুদ্ধ হবে, কেউ জানে না কে শহীদ হবে আর কে জীবিত থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ বলেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি; আমার শাহাদাত লাভের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।' অতঃপর বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লার সাথে পিপাসার্ত-ক্ষুধার্ত অবস্থায় মিলিত হওয়ার চেয়ে পরিতৃপ্ত অবস্থায় ও ভরাপেটে মিলিত হওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়।' আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলিত তো হতেই হবে, তাই (আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে) তৃপ্তির সাথে খেয়ে-দেয়ে মিলিত হব। এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার প্রত্যাশা। এজন্য আমি এটি পান করছি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাহাবীদের ভালোবাসার রীতি বড়োই চিত্তাকর্ষক আর এর জন্য তাদের প্রস্তুতির ধরনও অভিনব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ ও হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। হযরত হামযা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের মামা ছিলেন আর শাহাদাতের সময় তার বয়স চল্লিশের কিছু ঊর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার রেখে যাওয়া সম্পদের অভিভাবক হন আর তিনি (সা.) খায়বারে তার ছেলেদের সম্পত্তি কিনে দেন।

এরপর হযরত আবু সা'দ খায়সামা বিন আবু খায়সামার শাহাদাত এবং এর জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে দোয়ার আবেদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। [অর্থাৎ তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন যার উল্লেখ পাওয়া যায়।] মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেন, খায়সামা উহুদের দিন নিবেদন করেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। আল্লাহ্র কসম! আমি যুদ্ধের বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলাম এমনকি আমি বদরের যাওয়ার জন্য লটারিও করেছিলাম কিন্তু লটারিতে আমার পুত্র সা'দ বিন খায়সামার নাম ওঠে আর সে বদরে শাহাদাত বরণ করে। বিগত রাতে স্বপ্নে আমি তাকে খুব সুন্দর অবস্থায় দেখেছি। সে জান্নাতের বাগানসমূহ এবং নহরসমূহে পায়চারি করছিল

আর বলছিল, 'আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা জান্নাতে একত্রে থাকব। আমি আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছি।' আল্লাহ্‌র কসম! আমি জান্নাতে তার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশী।" [অর্থাৎ আমি সেখানে গিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।] তিনি (রা.) বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে শাহাদাত এবং জান্নাতে তার সাহচর্য দান করেন। তখন মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন। তদনুযায়ী তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের শাহাদাতের ঘটনারও এক রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যখন উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন নিজ পুত্র হযরত জাবেরকে ডেকে বললেন, 'হে আমার পুত্র! আমি নিজেকে প্রথম সারির শহীদদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার অবর্তমানে মহানবী (সা.)-এর সত্তার পর তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না যে আমার কাছে অধিক প্রিয়। [অর্থাৎ এই দুটি সত্তা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয়। সর্বাগ্রে মহানবী (সা.)-এর সত্তা; এরপর তুমি, হে আমার পুত্র!] আমার কিছু ঋণ আছে। আমার পক্ষ থেকে তুমি সেই ঋণগুলো পরিশোধ করে দিবে। আমি তোমাকে তোমার বোনদের সাথে উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। [নিজ বোনদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করবে না]। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, পরবর্তী প্রভাতে আমার পিতা সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন আর শত্রুরা তাঁর নাক ও কান কেটে ফেলে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের শহীদদের দাফন করার জন্য আসেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে তাদের ক্ষতসহ দাফন করে দাও কেননা আমি তাদের ওপর সাক্ষী। যে মুসলমানকেই আল্লাহ্‌র পথে আহত করা হয় সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, তার রক্ত বইতে থাকবে আর তার দেহের রং হবে জাফরানের ন্যায় আর তার দেহের সুগন্ধ হবে কস্তুরির ন্যায়। [অর্থাৎ এরা হবে পছন্দনীয় মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হবে; তাদেরকে গোসল দেয়া এবং কাফন ইত্যাদি পরানোর কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের পরিহিত পোশাকই তাদের কাফন।] হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমার পিতাকে একটি চাদর কাফন হিসেবে পরিধান করানো হয়। তখন মহানবী (সা.) বলছিলেন, এদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানে। [যখন শহীদদের দাফন করা হচ্ছিল তখন তিনি (সা.) বলছিলেন, তাদের মাঝে কে কুরআনের জ্ঞান বেশি রাখত?]। যখন কোনো একজনের দিকে ইশারা করা হতো যে, ইনি বেশি কুরআন জানতেন– তখন মহানবী (সা.) বলতেন, তার সাথিদের পূর্বে তাকে কবরে নামাও। [কুরআনের জ্ঞান যিনি বেশি রাখতেন তাকে প্রথমে দাফন করতেন।]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) উহুদের দিন সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। তাকে দাফন করার সময় মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) এবং আমর বিন জামুহ (রা.)-কে একই কবরে দাফন করো কেননা তাদের উভয়ের মাঝে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। মহানবী (সা.) আরো বলেন, এ জগতে যেহেতু তারা পারস্পরিক ভালোবাসা রাখতো তাই তাদেরকে একই কবরে দাফন করো। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) রক্তিম বর্ণের ছিলেন এবং তার মাথার সামনের অংশে চুল ছিল না এবং ততটা দীর্ঘকায় ছিলেন না। কিন্তু হযরত আমর বিন জামুহ ছিলেন দীর্ঘকায়, তাই উভয়কে চেনা গেছে এবং দুজনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায়

আনা হয়েছিল, বিশেষত কান এবং নাক। তার মরদেহ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি তার চেহারা থেকে কাপড় উঠাচ্ছিলাম; লোকেরা আমাকে তা করতে নিষেধ করে। এরপর লোকেরা এক মহিলার চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়। তখন কেউ বলল, সে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের কন্যা। তার নাম ছিল হযরত ফাতেমা বিনতে আমর অথবা এটিও বলা হয়, সে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বোন ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কেঁদো না। কেননা ফেরেশতারা স্থায়ীভাবে স্বীয় ডানা দ্বারা তাকে ছায়াবৃত করে রেখেছে। সে জান্নাতী, সৌভাগ্যবান; তার জন্য কাঁদার প্রয়োজন নেই।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতাকে উহুদের দিন যখন নিয়ে আসা হয় তখন আমার ফুফু তার জন্য কাঁদছিলেন আর আমিও কাঁদছিলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (রা.) আমাকে নিষেধ করেন নি। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা তার জন্য ক্রন্দন করো বা না করো– তাতে কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাকে দাফন করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার ওপর স্বীয় ডানার ছায়া বিস্তৃত করে রেখেছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা বাকারার একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। তারা খোদা তা'লার জীবন্ত সৈনিক আর খোদা তা'লা নিশ্চিতভাবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তিনি বলেন, দেখ! একজন সাহাবীকে শহীদ করা হলো তার বিপরীতে মুশরিকদের পাঁচ ব্যক্তি নিহত হয়েছে আর প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানের বিপরীতে কাফিররা অনেক সংখ্যায় ধ্বংস হয়েছে, কেবলমাত্র উহুদের যুদ্ধ ব্যতিরেকে যেখানে অনেক মুসলমানকে নিহত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য যুদ্ধে এর প্রতিশোধ নিয়েছেন।

উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) সেদিন দুর্বলতার কারণে বসে নামায আদায় করেছিলেন আর সেই নামায ছিল যোহরের নামায। তাঁর (সা.) পেছনে সাহাবীরাও বসে নামায আদায় করেছিলেন। [যেহেতু তিনি (সা.) বসে নামায আদায় করেছিলেন তাই সাহাবীরাও বসে নামায আদায় করেন, দাঁড়িয়ে পড়েন নি।] লেখক লিখেছেন, সম্ভবত এই নামায শত্রুদের চলে যাওয়ার পর আদায় করা হয়েছিল। সাহাবীদের বসে নামায আদায়ের কারণ হলো, ইমাম এবং মুক্তাদির নামায আদায় যেন অভিন্ন হয়। পরবর্তীতে এ আদেশ রহিত হয়; অর্থাৎ এটি আবশ্যক নয় যে, (বসে নামায আদায় করতে হবে)। মুক্তাদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারবে। লেখকের ধারণা হলো, হতে পারে যারা বসে নামায আদায় করেছেন তারাও হয়ত আহত ছিলেন; আর যেহেতু অধিকাংশ সাহাবী আহত ছিলেন যারা বসে নামায আদায় করেছিলেন– তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, মুসলমানরা বসে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীও ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র তারা যারা আহত হন নি আর এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক কম ছিল। অধিকাংশ সাহাবী আহত ছিলেন। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠকে দৃষ্টিপটে রেখে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুক্তাদিরা সবাই বসে নামায আদায় করেছেন। এটি সীরাতে হালাবিয়ার উদ্ধৃতি।

এখন কথা হবে উহুদের শহীদদের সংখ্যা সম্পর্কে। উহুদের শহীদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমদের অভিমত হলো, সেদিন মোট নিহত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৭০। যাদের মাঝে চারজন মুহাজির ছিলেন। যাদের নাম যথাক্রমে– হযরত হামযা, হযরত মুসআব, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ, এবং হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.)। একটি

অভিমত অনুসারে উহুদের শহীদের সংখ্যা ছিল ৮০জন, যাদের মাঝে ৭৪জন ছিলেন আনসারী সাহাবী আর বাকি ৬জন মুহাজির ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, যদি ছয়জন মুহাজির শহীদ হন তাহলে সম্ভবত পঞ্চম শহীদ হবেন হাতেব বিন বালতা'র ক্রীতদাস সা'দ এবং ষষ্ঠ ছিলেন সাকিব বিন আমর যিনি বনু আবদে শামস গোত্রের মিত্র ছিলেন।

'উয়ুনুল আসর' নামে একটি পুস্তক রয়েছে যাতে শহীদের মোট সংখ্যা ৯৬জন বলা হয়েছে। মুশরিকদের মাঝে নিহতদের মোট সংখ্যা ছিল ২৩জন। একটি অভিমত হলো, মুশরিকদের (নিহতের) সংখ্যা ২২জন ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই যুদ্ধে একা হযরত হামযা একত্রিশজন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। যদিও এই রেওয়ায়েত সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা তাদের নিহতদের মোট সংখ্যাই ছিল ২৩জন। একজন জীবনীকার উহুদের শহীদদের সংখ্যা সম্পর্কে লিখেন, উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শাহাদাতের সম্মান লাভকারী সাহাবীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ঐতিহাসিক, জীবনীকার এবং হাদীস বিশারদদের মতে উহুদের শহীদদের সংখ্যা সম্পর্কে ৪৯ থেকে শুরু করে ১০৮ পর্যন্ত অভিমত পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, উহুদের দিন সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা নামায এবং দাফন-কাফনের উল্লেখও দেখা যায়। শহীদদের জানাযা নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদেরকে দুজন করে একসাথে একই কাপড়ে আবৃত করতেন এবং এরপর জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মাঝে কে বেশি কুরআন জানতেন? এরপর যখন তাদের মাঝে কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হতো তখন মহানবী (সা.) তাকে প্রথমে কবরে রাখতেন। একই কাপড়ে আবৃত থাকলে ডান-বাম করে একজনকে প্রথমে দাফন করা হতো, এরপর অন্যজনকে। এরপর তিনি (সা.) বলতেন, 'আমি কিয়ামতের দিন তাদের বিষয়ে সাক্ষী থাকব।' আর তাদেরকে মহানবী (সা.) রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করার আদেশ দিতেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হয় নি আর তাদের জানাযাও পড়ানো হয় নি। সহীহ বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েতে হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদিন আসেন এবং তিনি (সা.) একজন শহীদের জানাযা পড়েন। বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি (সা.) উহুদের শহীদদের জানাযা উহুদের যুদ্ধের ৮ বছর পর পড়িয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকৃত বিভিন্ন রেওয়ায়েত সামনে এসেছে যা উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় তখন পড়া হয় নি। পরবর্তীতে কোনো এক সময় জানাযা পড়া হয়েছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের শহীদদের মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হতো। মহানবী (সা.) দশজন দশজন শহীদদের জানাযা একসাথে পড়েছেন আর হযরত হামযার লাশ মহানবী (সা.)-এর সামনেই থাকত আর বাকি শহীদদের সরিয়ে নেয়া হতো। হতে পারে এক্ষেত্রেও তারা ভুল বুঝেছে।

সুনানে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেওয়া হয় নি আর তাদেরকে তাদের রক্ত অর্থাৎ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল। আর তাদের মাঝে কারো জানাযা নামায পড়া হয় নি। সুনানে

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হামযা ব্যতীত আর কোনো শহীদের জানাযা পড়েন নি।

সুনানে তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি। অধিকাংশের মতামত হলো, জানাযা পড়া হয় নি। সীরাতে ইবনে হিশাম ও সীরাতে হালাবিয়্যাতে লেখা আছে, মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত হামযার জানাযা পড়ান। তিনি জানাযার নামাযে সাতবার তাকবীর দিয়েছেন। সীরাতে হালাবিয়্যা অনুসারে চারবার তাকবীর দেয়া হয়। এরপর বাকি শহীদদের একে একে নিয়ে এসে হামযা (রা.)-র লাশের পাশে রাখা হতো এবং তিনি (সা.) উভয়ের জানাযা পড়েছেন, এভাবেই সকল শহীদের জানাযা একবার আর হযরত হামযা (রা.)-র জানাযা বাহাত্তর বার আর কারো কারো মতে বিরানব্বই বার পড়া হয়েছিল। সবকটি রেওয়ায়েত লিখে দেওয়া হলেও এসবের মাঝে কিছু দুর্বল রেওয়ায়েতও রয়েছে।

'দালায়েলুন নবুওয়া' নামক জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হামযা (রা.)-র মৃতদেহের কাছে নয়জন শহীদকে একত্রে আনা হতো আর তাদের জানাযার নামায পড়া হতো। তারপর এই নয়জনকে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য নয়জন শহীদকে নিয়ে আসা হতো আর এভাবে এই সকল শহীদের জানাযার নামায পড়া হয়। আর তিনি (সা.) প্রতিবার জানাযার নামাযে সাত তাকবীর দিয়েছিলেন। সীরাতে হালাবিয়্যা ও দালায়েলুন নবুওয়া গ্রন্থে উহুদের শহীদদের জানাযার নামায সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এ দুটি গ্রন্থে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে তাদের রক্তমাখা দেহেই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের গোসলও করানো হয় নি বা তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি। এই বর্ণনাকে বেশি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়। তাই চূড়ান্ত কথা হলো, জানাযার নামায পড়া হয় নি।

হযরত ইমাম শাফী (রহ.) বর্ণনা করেন, নিরবচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এটি দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদের জানাযা পড়েন নি। আর যে–সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) শহীদদের জানাযা পড়েছেন এবং হযরত হামযা (রা.)-র জানাযা সত্তরবার পড়েছেন– সেগুলো সঠিক নয়। হযরত উকবা বিন আমর (রা.)-র রেওয়ায়েত হলো, 'মহানবী (সা.) ৮ বছর পর শহীদদের জানাযা পড়েছেন।' এতে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি আট বছর পরের ঘটনা; তখনকার ঘটনা। ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে বাবুস্ সালাতে আলাশ্ শহীদ অর্থাৎ শহীদদের জানাযার নামাযের বিষয়ে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। আর এ বিষয়ে মাত্র দুটি হাদীস সংকলন করেছেন। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত প্রথম হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, উহুদের যুদ্ধে শহীদদের গোসল করানো হয় নি এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি, অপরদিকে দ্বিতীয় হাদীসে হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت অর্থাৎ একদিন মহানবী (সা.) বের হয়ে উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়ানোর আদলে নামায পড়ান। বুখারীতেও এ হাদীসটিই উহুদের যুদ্ধের অধ্যায়ে অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একই সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন,

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) উহুদের শহীদদের জন্য আট বছর পর সেভাবেই জানাযা পড়েছিলেন যেভাবে জীবিত বা মৃতদের বিদায় জানানো হয়।

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, ইমাম শাফী (রহ.)-এর এই কথার অর্থ হলো, কারো মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার কবরে জানাযা পড়া হয় না। ইমাম শাফী (রহ.)-এর মতে, মহানবী (সা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি সেই শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে তাদেরকে বিদায় জানান আর তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জামাতের অবস্থানও সেটিই যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন। এটি স্পষ্ট কথা যে, তখন জানাযার নামায পড়া হয় নি। অর্থাৎ এমন সব রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলো অনুসারে শহীদদের জানাযা পড়া হয় নি। তিনি (রা.)-ও এটিই লিখেছেন যে, জানাযা নামায আদায় করা হয় নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন মহানবী (সা.) বিশেষভাবে উহুদের শহীদদের জানাযার নামায আদায় করেছেন আর অত্যন্ত বিগলিতচিত্তে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। এ ধরনের আরো কিছু বর্ণনা আছে। বর্ণনার এই ধারা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাই। যুদ্ধের আগুন এখন ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এখন অনেক দোয়ার প্রয়োজন। এখন যদি আহমদীরা দোয়া করে তবেই কিছু হওয়া সম্ভব। ইসরাঈলী সরকার তাদের হঠকারিতায় অনড়। প্রত্যেক কথায় তারা কোনো না কোনো অজুহাত খুঁজে বলে দিচ্ছে, আমরা এই কারণে এটি করেছি; আর কোনো কথা বা যুক্তির কথা তারা মানতে চায় না। পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিধর দেশগুলোও যাচ্ছেতাই আচরণ করছে বা তারাও ইসরাঈলকে ভয় পায়। এরা প্রথমে বলে, যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত, নির্যাতন বন্ধ করা উচিত। কিন্তু যখন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বা তার সরকার কোনো বিবৃতি দেয় তখন তারাও সেই সুরে সুর মেলায়। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন আর তাদেরকে খোদা তা'লার দিকে বিনত করুন। এটিই একমাত্র উপায় যা অনুসরণ করলে এই লোকেরা তাদের ইহকার ও পরকাল সুন্দর করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন আর আমাদেরকেও দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের প্রতিও দয়া করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)